জনপ্রিয় সেলিম কাবাব ঘর

নাহিন আশরাফ

মোহাম্মদপুরকে বলা হয় কাবাবের এলাকা। জন্ম এদেশে না হলেও কাবাব বাঙালির মন ও রান্নাঘর দু'জায়গাই দখল করে নিয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, তুরস্কের সৈন্যরা ক্ষুধা নিবারণের জন্য পশু শিকার করে তলোয়ারের মধ্যে গেঁথে আগুনে পুড়িয়ে খেতো। এভাবেই কাবারের জন্ম। কিন্তু তখন ব্যবহার করা হতো না এতো রকমের দেশ-বিদেশের মশলা। ক্ষুধা মেটানোর জন্য কোনো রকমে পুড়িয়ে খাওয়া হতো। তুরস্কে জন্ম হলেও কাবাব আফগানদের মাধ্যমে ভারতে আসে। ১২০৬-১৫২৬ সালে রাজা বাদশাহদের নানা রকম কাবাব পরিবেশন করা হতো। এমনকি উৎসব আয়োজনে রাজবাড়ির প্রধান খাদ্য ছিল কাবাব। সেসময় অভিজাতদের মাধ্যমে কাবাব পৌঁছে যায় সাধারণ মানুষের কাছে। বোঝা যাচ্ছে, কাবাব একসময় অভিজাতদের খাবার ছিল। কিন্তু এখন আর শুধু অভিজাতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, কাবাব এখন সবার সাধ্যের মধ্যে পৌঁছে গেছে।

মোহাম্মদপুরের অলিতে গলিতে আর কিছু না থাকুক একটি কাবাবের দোকান চোখে পড়বেই। এর মধ্যে একটি বিখ্যাত কাবাবের দোকান সেলিম কাবাব ঘর। কাবারপ্রিয়রা ঢাকার যে প্রান্তেই থাকুক না কেন সেলিম কাবাব ঘরে কাবারের স্বাদ নিতে যাবেই। ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে সেলিম কাবাব ঘর তাদের মান ধরে রেখেছে। সেলিম কাবাব ঘর অবস্থিত মোহাম্মদপুরের শহিদ সলিমুল্লাহ রোডে, দোকান নাম্বার ১১। সেখানে গেলে সাইনবোর্ডে চোখে পড়বে প্রয়াত সেলিম খানের ছবি। যার হাত ধরে সৃষ্টি হয় সেলিম কাবাব ঘরের।

সেলিম কাবাব ঘরের ইতিহাস নিয়ে কথা হয় সেলিম খানের ছেলে লিয়াকত খানের সঙ্গে। যিনি বাবার অবর্তমানে সেলিম কাবাব ঘরের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি জানান, দোকানটির পথচলা শুরু করে ১৯৭৮ সালে। প্রতিষ্ঠাতা সেলিম খানের জন্ম ভারতের বিহারে। তার বাবা-মা ছিলেন বিহারি। খুব অল্প বয়সে বাবা-মায়ের হাত ধরে এদেশে আসেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আবারো ভারতে ফিরে যান। তার পরিবার তখন রাস্তার ধারে নিহারি বিক্রি করতো। ভারতের এক হেকিম সেই নিহারি খেয়ে সেলিম খানকে বলেন, রান্না আরো ভালো করতে তুমি আরো কিছু মশলা ব্যবহার করো। তখন সেই হাকিম তাদের কিছু মশলা বানানোর পদ্ধতি শিখিয়ে দেন।

কিছুদিন পর সেলিম খান দেশে ফিরে আসেন। দেশে এসে তিনি হাকিমের শেখানো মসলা দিয়ে প্রথমে গরুর মাংসের শিক কাবাব বানান। ১১ ধরনের উপাদানে তৈরি গোপন রেসিপির মসলা দিয়ে কাবাব বানাতে শুরু করেন তিনি। প্রথমে তিনি শুধু শিক কাবাবই বানাতেন। কিছুদিনের মধ্যে তার কাবাবের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। অনেক দূর থেকে মানুষ তার কাবাব খেতে ভিড় করতে থাকে। সেলিম খান ১৯৯৩ সালে মারা যান। মারা যাবার তিনদিন আগে তার ছেলে লিয়াকত খানকে ডেকে বলেন, 'তোমরা আমার পাশে এসে বসো। আমি তোমাদের কাবাব ও মশলা বানানো শিখাবো।' তিনি পুরো পদ্ধতি ছেলে লিয়াকতকে শেখান। তার ঠিক তিনদিন পরেই তিনি মারা যান।

বাবার মৃত্যুর পর মাত্র ১৫ বছর বয়সে সেলিম কাবাব ঘরের দায়িত্ব নেন লিয়াকত খান। লিয়াকত ছোটবেলা থেকে বাবাকে কাবাব বানাতে দেখে বড় হয়েছেন। বাবা কাবাব বানাতেন। সবাইকে আপ্যায়ন করে খাওয়াতেন। তা বেশ উপভোগ করতেন লিয়াকত। সেই থেকে ব্যবসা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হয় তার। তবে চোখে দেখা আর নিজে ব্যবসা সামলানো মোটেও এক না বলে জানান লিয়াকত খান। মৃত্যুর পর বাবার খ্যাতি ও সম্মান ধরে রাখতে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাকে। তবে লিয়াকত যখন ব্যবসার হাল ধরেন তখন বয়স কম হওয়ায় তার মা তাকে সাহায্য করতেন। কিন্তু কিছুদিন পর লিয়াকত নিজেই পুরো দায়িত্ব নেন।

সেলিম কাবাবের নাম ছড়িয়ে যাওয়ার পেছনে লিয়াকতের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পর জীবন তার জন্য খুব সহজ ছিল না। কঠিন পথ পাড়ি দিতে কেউ তাকে সাহায্য করেনি। লিয়াকত জানান, যদি সততা ও পরিশ্রম

দিয়ে সেলিম কাবাব ধরে রাখা না যেত তবে এটি তার বাবার মৃত্যুর পরেই হারিয়ে যেত। জীবনের অনেক উত্থান-পতনের মধ্যেও লিয়াকত ব্যবসার জায়গাটা অটুট থেকেছেন। সব সময় চেষ্টা করেছেন তার বাবা সবার সাথে যে কাবাবের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সেই সুনাম যাতে আজীবন ধরে রাখতে পারেন।

সেলিম কাবাব ঘর মূলত জমে উঠে সন্ধ্যার পর। দোকানটির দুই পাশে দুইটি শাখা চোখে পড়বে। তবে যে শাখাটি সবচেয়ে পুরোনো তা দেখে বোঝা যাবে। কারণ এটি পুরোটা টিনশেডের। সেলিম খান ঠিক যেমন করে তৈরি করেছিলেন, দোকানটি এখনো তেমনি আছে। তা নিয়ে অবশ্য মাথাব্যথা নেই লিয়াকতের। কারণ তিনি বাবার ঐতিহ্য ধরে রাখতে চান। লিয়াকত বলেন, আমার দোকানে এমন অনেক কাস্টমার এসেছেন যারা প্রথমে দোকান দেখে নাক সিঁটকিয়েছেন, কটূ কথা বলেছেন। কিন্তু একবার আমার বানানো কাবার মুখে দেওয়ার পর এতো ভালো লেগেছে যে তারা এই স্বাদ নিতে বারবার পুরানো ভাঙা দোকানেই এসেছেন। লিয়াকত এখনো নিজের হাতে কাবাব তৈরি করেন। তার দোকানে ১০ জন কর্মচারী নিয়োজিত থাকলেও কাবাব তৈরির দায়িত্ব তিনি অন্য কাউকেই দেন না। কাবাবে যে বিশেষ মশলা ব্যবহার করা হয় তার রহস্য কারো কাছেই প্রকাশ করেন না লিয়াকত। তিনি শুধু বলেন, আমার কাবাব চাইলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। খাবারের রং, সোডা, টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করা হয় না। আর দেশি মুরগি দিয়ে কাবাব তৈরি করা হয়।

বিকাল ৪টা না বাজতেই সেলিম কাবাবের সামনে দেখা যায় কাস্টমারদের ভিড়। তারা ঢাকার নানা প্রান্ত থেকে শুধুমাত্র সেলিম কাবাব ঘরের কাবাব খেতে এখানে এসেছে। ছোট একটা ঘর। প্রতি টেবিলে হয়তো ৫ জন বসতে পারবে। আর পুরো ঘরে ১৫ জনের বেশি মানুষের জায়গা হবে না। তাও সবাই একসাথে ঠেলাঠেলি করে খাচ্ছে। এতেও কারো কোনো আপত্তি নেই। কারণ সবার চাওয়া শুধু সেলিমের কাবাব। সেলিম খান শিক কাবাব দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এখন অনেক ধরনের কাবাব আইটেম পাওয়া যায়। যেমন গরুর চাপ ১৩০ টাকা, মুরগির চাপ ১২০ টাকা, মগজ ফ্রাই ১১০ টাকা। সাথে গরম ফুলকো লুচি ৫ টাকা করে। এছাড়া চিকেন সাসলিক পাওয়া যায় ৪০ টাকা করে। তাদের দোকানে বেশ জনপ্রিয় হয়েছে কিমা পুরি, যার দাম ১০ টাকা। আরো রয়েছে গরুর কাবাব রোল, দাম ৩০ টাকা।

তবে শুরু থেকে আজও সেলিম কাবাবে সবচেয়ে বেশি চাহিদা গরুর শিক কাবাবের। হবেই না কেন। গরুর শিক কাবাব মুখে দেওয়ার সাথে সাথেই বুঝে যাবেন, এই স্বাদ যে আসলেই অন্য কাবাব থেকে ভিন্ন। অন্য শিক কাবাবের মতো এটি একদম নরম কিংবা শক্ত না। মাংস থাকে গোটা গোটা যা মুখে দিলেই মনে হবে অসাধারণ। অনেক জায়গায় বেশি ঝাল দিয়ে কাবাবের আসল স্বাদই যেন মুছে ফেলা হয়। কিন্তু সেলিম কাবাবে এমনটা নেই। এদের ঝাল মশলা সবকিছুর রয়েছে সঠিক ভারসাম্য।

কথা হয় সেলিম কাবাব ঘরের কিছু নিয়মিত কাস্টমারদের সাথে। যাদের কাছে কাবাব মানেই সেলিম কাবাব। বেইলি রোড থেকে সেলিম কাবাবে খেতে আসেন মারুফ। তার এক বন্ধু কানাডা থেকে দেশে এসেছেন। বন্ধুর আবদার ছিল, দেশের কিছু বিখ্যাত খাবার খাওয়াতে হবে। তাই বন্ধুকে নিয়ে এসেছেন সেলিম কাবাব ঘরে। এছাড়া অনেকে সন্ধ্যার নাস্তায় কাবাব নিয়ে বাড়ি ফিরবেন বলে দোকানের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

লিয়াকত খান জানান, তার কাবাবের এতো চাহিদা থাকার পরেও ফুড পান্ডাতে তারা নেই। কারণ এতে তার খুব বেশি লাভ হয় না। তার নিয়মিত কাস্টমাররা দোকানে এসেই কাবাব উপভোগ করেন। সবশেষে সেলিম কাবাব ঘর নিয়ে তার পরিকল্পনা কী জানতে চাইলে বলেন, তার বিশেষ কোনো পরিকল্পনা নেই। তিনি শুধু খাবারের মান ধরে রাখতে চান। যাতে কাস্টমাররা অভিযোগ করতে না পারেন যে সেলিম কাবাব ঘর আর আগের মতো নেই।